মহাকাব্যে ও পুরাণে প্রতিবন্ধীচেতনা

পাঁচুগোপাল বক্সি

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

।।প্রস্তাবনা।।	৯
।। প্রতিবন্ধী বা অসমর্থ—সংজ্ঞা ও স্বরূপ ।।	১৬
।। তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত আলোচনা ঃ	১৯
(ক) ভারতীয় পুরাণ ও পাশ্চাত্য পুরাণ	১৯
(খ) উপকথা ঃ রূপকথা ঃ সাঙ্কেতিক ঃ রূপক প্রভৃতি এবং পুরাণ	৮৯
।। রামায়ণ মহাভারতের ঐতিহাসিকতা ।।	৯৯
।। শ্রীকৃষ্ণ— বেদে, গীতায়, পুরাণে ও ইতিহাসে ।।	১০৬
।। বাঙালির পুরাণচেতনা ।।	১৪১
।। মহাকাব্যে ও পুরাণে প্রতিবন্ধী চেতনা ।।	১৪১
।। মহাকাব্যে ও পুরাণে প্রতিবন্ধী চেতনায় বিশিষ্টতা ।।	৪১০

মহাকবি ও পুরাণকারগণ মূলত জীবনরসিক, শ্রেয়োবাদী। আস্তিক্যবাদ বা ভক্তিবাদ তাঁদের জীবনের সর্বস্ব নয়, জীবন-রসায়নের অন্যতম মৌল উপাদান। তাঁদের এক চোখ যখন ঊর্ধ্বমুখী, অপর চোখের দৃষ্টি তখন মাটির পৃথিবীর পানে। বিভিন্ন শাস্ত্রে অতলান্ত প্রজ্ঞা ছাড়াও পার্থিব জগৎ, প্রাত্যহিক জীবন সম্পর্কে তাঁদের কৌতূহল ও অভিজ্ঞতা যেমন গভীর, অনুভূতি ও অনুমান ক্ষমতা যেমন প্রবল, তেমনি বৃহত্তর সমাজ প্রতিবেশ, দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, লৌকিক বিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতি সম্পর্কেও তাঁদের অনুসন্ধিৎসা অদম্য। তাঁদের সেই ভূয়োদর্শিতা ও দুরবগাহ জীবনবোধের মূল অংশটুকুই (nucleus) বীজাকারে পরিবেশিত হয়েছে তাঁদের রচনায় তা সে যতই বৃহদায়ত হোক না কেন।

সমকালীন ঘটনা বা ইতিহাসের ছায়ায় রচিত এই সব প্রাচীন গ্রন্থে শুধু ভারতবর্ষের ধর্ম সমাজ বা ঘরের কথা নেই ; আছে মনুষ্যত্ব ও মুক্তিচেতনার মজ্জা (core), পরিণামমুখী মানবসভ্যতার ক্রমবিবর্তনের রূপরেখা যা হাজার হাজার বছর পরে আজও প্রাসঙ্গিক, আগামী দিনেও উপযোগী।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রাচীনযুগের বিস্ময়কর ও অনুপম শিল্প-ভাস্কর্য, দর্শন, গণতান্ত্রিক আদর্শ, আধুনিক গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, ভেষজ, প্রযুক্তি তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় সেকালের শাস্ত্র বা সাহিত্যের নানা সূত্রের ও অসংখ্য মূল্যবান তত্ত্ব বা তথ্যের প্রয়োগ এবং বহু পুরনো সে-সব খনিগর্ভে আর-ও প্রত্ন-রত্ন অনুসন্ধানের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস থেকে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের অন্যান্য মহার্ঘ উত্তরাধিকারের মতো প্রাচীন মহাকাব্য ও পুরাণগুলির-ও নতুন করে মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে। এগুলিকে আকাশকুসুম কল্পনাবিলাস ভ্রমে সেকেলে অচ্ছুৎ বলে দূরে সরিয়ে না রেখে যুক্তিবাদী মানবিক দৃষ্টিতে বিচার-বিশ্লেষণ করা দরকার। প্রতিভাবান কবিগণের রচনায় তাঁদের নিজ নিজ যে গভীর জীবনবোধ, যে প্রত্যয়-প্রবর্তনা ও হিতৈষণা প্রতিফলিত, তা অনুধাবন করা উচিত। এই সব কালোত্তীর্ণ সৃষ্টির অন্তর্নিহিত সতর্কীকরণ বাণী বা গূঢ় তাৎপর্য নিজেদের কল্যাণেই যাপনের কারিগরি ও জীবনের উত্তরণের উপায় হিসেবেই অনুসরণ করা প্রয়োজন।

শেকস্‌পিয়র রবীন্দ্রনাথের মতো মহাকবিগণের ভাবনার নিঃসীম গভীরতা এবং কল্পনার বিপুল বিস্তার ও বৈচিত্র্য দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণগুলির রচয়িতাদের সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। তবে মনে রাখা দরকার, প্রাচীন কবিদের সামনে দৃষ্টান্তমূলক কোন গ্রন্থ ছিল না।

রামায়ণে অগ্নিকুণ্ডে সীতার প্রবেশের পরে ব্রহ্মা রামচন্দ্রের কাছে স্বয়ং নারায়ণ হয়ে লক্ষ্মীর সঙ্গে 'সামান্য মানুষ হেন কর ব্যবহার' বলে অনুযোগ করলে—

শ্রীরাম বলেন মম মানুষেতে জন্ম।
মানুষ হইয়া করি মানুষের কর্ম্ম ।। [কৃ. রা. পৃঃ ৪৯৪]

যিনি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর রূপে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের নিয়ন্তা, তিনি রাম অবতাররূপে

অবতীর্ণ হয়ে মানুষের মতো আচরণ করছেন। তাঁর প্রতিটি আচরণ যে ন্যায়সঙ্গত সুবিবেচনাপ্রসূত বা গৌরবজনক তা-ও বলা যাচ্ছে না। তাঁর কথায় ও কাজে (বালি বধ, সীতাকে পরিত্যাগ, সীতার অগ্নিপরীক্ষা প্রভৃতি) মাঝে মাঝে নীতিহীনতা, শঠতা, নির্দয়তার পরিচয়ও পাওয়া যায়। আর এটাই তো স্বাভাবিক কেন না রাম পরিচয়ে তিনি কৃত্তের মতোই কিছু আলো কিছু ধুলো দিয়ে গড়া মর্তের জীব। সেকালের কবিদের দৃষ্টিতে তাই রাম-সীতা কৃত্তের মানুষী সত্তাটিই প্রাধান্য লাভ করেছে।

স্বর্গের দেবতাদেরও কারবার মানুষকে নিয়ে। মানুষই দেবতা গড়ে ; তাঁদের মহিমা প্রচার করে। স্রষ্টা মানুষ তাঁদের সৃষ্ট দেবতাকে দেখেছেন একান্তই মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে ; মেপেছেন তাঁদের মহিমা ও হীনতা একেবারে নিক্তির ওজনে ; অসংকোচে নির্ভয়ে। দেবতাদের অলৌকিক ক্ষমতায় আস্থা রেখেও তাঁদের দোষ-ত্রুটি-পাপাচার বর্ণনা করেছেন কবিসুলভ নিরপেক্ষ বিচার (poetic justice) করে এবং নিষ্ক্রিয় দর্শক (passive onlooker) রূপে। অনৈতিক আচরণের অপরাধে দেবতাদের দণ্ডভোগের উল্লেখ করে প্রাচীন কবিগণ বুঝিয়ে দিয়েছেন, স্বর্গের দেবতারা অমরত্বের অধিকারী হলেও বিধানের ঊর্ধ্বে নন।

লোক নিস্তারণ বা মানুষের মুক্তি ও কল্যাণ কামনা প্রাচীন কবিগণের সাহিত্যসাধনার প্রেরণা জুগিয়েছে। সেই উদ্দেশ্যে তাঁদেরকে ধর্মতত্ত্ব, আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা প্রভৃতির অবতারণা করতে হয়েছে। আখ্যানধর্মী রচনায় সেই সব দুরূহ নীরস বিষয় সম্পর্কে তাঁরা আলোচনা করেছেন সরল ভাষায় ; যা করাটা আদৌ সহজসাধ্য নয়।

যৌন (Sex) ব্যাপারটাই মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনে ও জীবনযাপনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। কামশক্তি (Libido) তার যাবতীয় আবেগ আচরণ, চিন্তন, সৃষ্টিশীলতা প্রভৃতির প্রধান নিয়ন্ত্রক। অস্ট্রিয়ান মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়ডের (Sigmund Freud 1856-1939) মনোবিকলন তত্ত্বে (Doctrine of psycho analysis) এই সব তথ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কয়েক হাজার বছর আগে শারীরতত্ত্ব ও কামশাস্ত্রে সুপণ্ডিত আমাদের আদিকবিগণ দেবরাজ ইন্দ্র, দেবগুরু বৃহস্পতি, রাক্ষসরাজ রাবণ প্রভৃতি থেকে শুরু করে অসংখ্য মুনি ঋষির কামান্ধতার ও তার পরিণতি বর্ণনা করে যৌনবিজ্ঞানের (Sexology) সূচনা করেছেন। কামজ প্রেমের রভস ও শৃঙ্গারের বিবিধ পদ্ধতির বর্ণনার পাশাপাশি দেবতা-দানব মুনি-ঋষিদের রিপুতাড়না ও ব্যভিচারের দিকটিও তাঁরা স্বচ্ছন্দে তুলে ধরেছেন ; কোথাও এতটুকু জড়তা বা সংকোচ নেই ; কিছুই যেন লুকোবার নেই এমনই সহজ সাবলীল সে ভঙ্গিমা অথচ কোন বর্ণনাই অশ্লীল বা আরোপিত মনে হয় না।

জগৎ ও জীবন সম্পর্কে আদি কবিগণের দৃষ্টি ছিল অনাবিল ও অন্তর্ভেদী ; ধারণা ছিল সুস্পষ্ট, উপলব্ধি ছিল প্রত্যয়দৃঢ় আন্তরিক। বস্তু ও ভাবকে, প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিকতাকে মহাকাল ও মহাজীবনের সুবিশাল পটভূমিকায় তাঁরা মেলাতে পেরেছেন অনায়াস দক্ষতায়। তাঁদের ভাষার সরলতার বা রচনার প্রসাদগুণের প্রশংসা করতে হয়। মধ্যযুগের কবি কৃত্তিবাস যেমন নিঃসঙ্কোচে লিখতে পারেন, 'কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে

বিচক্ষণ' (কৃ. রা. ৫১) ; তেমনি প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ যাপনার নানা দিক, ব্যক্তিজীবনের অন্ধিসন্ধি অকপটে প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত করেছেন।

প্রতিবন্ধী চরিত্রগুলির মধ্যে কেউ শৌর্যে, কেউ প্রজ্ঞায়, কেউ দুরাচরণীয় তপস্যায় সিদ্ধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন ; কেউ বা দুর্জয় ইচ্ছাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। আখ্যানের কেন্দ্রীয় চরিত্র বা পার্শ্বচরিত্র হিসেবে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন এবং বৃহত্তর সমাজ জীবনে নিজ নিজ প্রতিভা বা কর্মনৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

দৈহিক বিকৃতি প্রতিবন্ধীদের মনে বা কাজে কোন ছাপ ফেলেনি, কোন রকম মানসিক বিকার, হীনম্মন্যতা বা পলায়নী মনোভাবের সৃষ্টি করেনি বরং আখ্যানে ভাববাদ ও জড়বাদের, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের, বদ্ধ আমি (lower self, ego sense) ও শুদ্ধ বা বুদ্ধ আমি (higher self, soul)-র বা দেবতা-মানব-দানবের সমন্বয় সাধনে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন ; শুভ ও অশুভ শক্তির দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টিতেও তাঁদের অবদান কম নয়।

প্রতিবন্ধী চরিত্রগুলির মধ্যে কয়েকটি রূপকধর্মী। কয়েকটি চরিত্র বিশেষ বিশেষ আদর্শ বা তত্ত্বের প্রতীক। কয়েকটি চরিত্র সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব-প্রকৃতির মানুষের প্রতিনিধিস্থানীয় বলা যেতে পারে। নীতিশিক্ষা, লোকশিক্ষা ও চরিত্র গঠনের দিক থেকে এই শ্রেণির চরিত্রগুলি বর্তমান যুগেও প্রাসঙ্গিক।

মহাকবি ও পুরাণকারদের দুরবগাহ ইতিহাসচেতনা, সমসাময়িক সমাজ সংসার তথা লৌকিক জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সুগভীর ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও মানব সভ্যতার গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা এবং মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে দক্ষতার রসায়নে জারিত প্রতিবন্ধী চরিত্রগুলির গা থেকে যুগসুলভ অবাস্তবতা অলৌকিকতার রংচঙে পোশাকটি খুলে ফেললে বেরিয়ে আসে আস্ত জীবন্ত মানুষ।

আলোচনা প্রসঙ্গে প্রতিবন্ধী ছাড়াও এমন কয়েকটি চরিত্র এসেছে যেগুলিকে সাধারণভাবে প্রতিবন্ধী বলা চলে না ; তবে তাদের জন্ম অস্বাভাবিক অলৌকিক উপায়ে ; যেমন, সীতা, দ্রৌপদী, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি। নানা ঘটনাসূত্রে এই চরিত্রগুলি প্রতিবন্ধী চরিত্রগুলির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে বা আখ্যানের আঙ্গিক ও গতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

মহাকাব্যে ও পুরাণে প্রতিবন্ধী চেতনার স্বরূপ তাৎপর্য ব্যাপ্তি ও গভীরতা এবং উপযোগিতা উপলব্ধি ও উপস্থাপনের যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। আরও কয়েকটি চরিত্র অন্তর্ভুক্ত হলে আলোচনাবৃত্তটি সম্পূর্ণ হত। প্রকৃতপক্ষে, এতগুলি গ্রন্থের ভেতর থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধী চরিত্রগুলিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তবে, দুই-চারটি পৌরাণিক প্রতিবন্ধী চরিত্র উহ্য থেকে গেলেও মূল বিষয়বস্তু প্রতিপাদিত হয়েছে বলেই বিশ্বাস।

বৈদিক ধর্মের স্বরূপের আদিযুগে, ঔপনিষদিক যুগে এবং পৌরাণিক যুগে যথাক্রমে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির প্রাধান্য লাভের ব্যাপারটিও আলোচনাসূত্রে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

মহাভারতের প্রাচীন নাম 'জয়'। এই গ্রন্থের মতো পুরাণাদি শাস্ত্রে ভক্তিমার্গ ও ভাগবত ধর্মের কথা বলা হয়েছে বলে এই সব শাস্ত্রকেও সাধারণভাবে 'জয়' বলা হয়।

মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা, কঠোপনিষৎ ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থে দৈবী ও আসুরী, শুভ ও অশুভ এই দুই বৃত্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব যুদ্ধ এবং মানবহৃদয় যুদ্ধক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র রূপকে বিধৃত।

আলোচনা প্রসঙ্গে বক্তব্যের সমর্থনে বা দৃষ্টান্ত হিসেবে বিভিন্ন গ্রন্থের অংশ বিশেষ উদ্ধার করা হয়েছে এবং উদ্ধৃতিগুলির সূত্র নির্দেশকালে সংক্ষেপণের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। যেমন, শ্রী বেণীমাধব শীল সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত (বৃহৎ অক্ষয় সংস্করণ) বোঝাতে সংক্ষেপে যথাক্রমে কৃ. রা. এবং কা. ম. লেখা হয়েছে। উদ্ধৃতাংশে গ্রন্থে ব্যবহৃত বানান (যেমন, ধর্ম্ম, মর্ম্ম, হৈল, বাএ, শবদেঁ প্রভৃতি) অবিকল অনুসৃত হয়েছে।

রাবণবধের পর সীতাদেবীকে নিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে সকল বর্ণ ও বৃত্তির কৌতূহলী নর-নারী, গর্ভবতী যুবতি লজ্জা-ভয় ত্যাগ করে তাঁদেরকে দেখতে পথে নেমেছিলেন। সেই জনারণ্যে ছিলেন অসংখ্য প্রতিবন্ধীও ঃ

কানা খোঁড়া শিশু বুড়া লয়ে অন্যজনে।
অন্ধজন চক্ষু পায় শ্রীরাম দর্শনে।। [কৃ. রা. ৫০৭]

সেদিনের প্রতিবন্ধীদের অন্তরে ছিল ভগবানকে দর্শনলাভের বাসনা, মুক্তিকামনা। আমাদের আলোচ্য প্রতিবন্ধী চরিত্রগুলি কামনা করে তন্নিষ্ঠ পাঠক-শ্রোতার সহৃদয় মনোযোগ। তারা চায় না হারিয়ে যেতে ; চায় নতুন মূল্যায়নের কষ্ঠিপাথরে যাচাই হতে। তারা চায় না করুণা, চায় সুবিবেচনা—

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরংময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু।। [শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অঃ ১৮ শ্লো. ৬৩']

লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রকাশনা সংস্থা 'পুনশ্চ'র উদ্যমী কর্ণধার সন্দীপ নায়কের আন্তরিক আগ্রহে এই গ্রন্থখানি রচিত ও প্রকাশিত হল। পুত্রসম সন্দীপকে আশিস্ ও শুভেচ্ছা জানাই। এই সংস্থার সপ্তর্ষি নায়ক, প্রণয় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত সকলের কল্যাণ কামনা করি। মঞ্জু বক্সি, ডাঃ সন্দীপন বক্সি, ডাঃ বিদিশা বক্সি, রণেন ও পিয়ালী চট্টোপাধ্যায়, স্বপ্নেশ বক্সি, প্রভাস কুমার মুখোপাধ্যায়, দীপ্তিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রখ্যাত চিকিৎসক শিবাজী বসু ও শান্তনু চট্টোপাধ্যায়ের নিরবচ্ছিন্ন অনুপ্রেরণা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। বিশিষ্ট সুকুমার শিল্পী অধ্যাপক মনোজ সরকার, অনন্ত চট্টোপাধ্যায়, বীথিকা চট্টোপাধ্যায়, নমিতা ও অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, বিক্রমজিৎ বক্সি, সুনীল কুণ্ডু ; সুবোধ সাহা, তপতী চক্রবর্তী, দীপক সাহা প্রমুখ দুষ্প্রাপ্য অনেক গ্রন্থ সংগ্রহ করে দিয়েছেন। তাঁদেরকে অভিনন্দন জানাই। ভক্তিপূর্ণ প্রণতি নিবেদন করি আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী বিশিষ্ট গবেষক ও শিক্ষাবিদ ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক মহাশয়কে।

গ্রন্থখানির মনোন্নয়নকল্পে প্রেরিত গঠনমূলক পরামর্শ বিবেচনার জন্যে সাদরে গৃহীত হবে। নমস্কার।

পাঁচুগোপাল বক্সি

প্রস্তাবনা

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্।।"

ভগবানের কৃপায় বোবার মুখে কথা ফোটে ; খোঁড়া পাহাড় পার হওয়ার সামর্থ্য লাভ করে। মহাকবিগণের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী কল্পনায় প্রতিবন্ধী অনেক চরিত্র তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। দৈহিক বাধা অস্বাভাবিকতাজনিত হতাশা উপেক্ষা করে চারিত্রিক বিশিষ্টতা ও ক্রিয়াপ্রাণতায় তারা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ঘটনা বিন্যাস, কাহিনি বয়ন, ভাব পরিস্ফুটন রসপরিণতি প্রভৃতিতে এই ধরনের পুরুষ ও নারী চরিত্রগুলির অবদান গুরুত্বপূর্ণ।

হাত পায়ের পাঁচটা আঙুল সমান নয়। সংসারে সব মানুষ স্বভাব-প্রকৃতি, চেহারা-চরিত্র, মেধা, হৃদয়বৃত্তি, চেতনা, জীবনদর্শন প্রভৃতি দিক থেকে একই রকম নয়। সুস্থ স্বাভাবিক লোকের মাঝে দু'একটা বিকলাঙ্গকে দেখা যায়। প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, অনেক প্রতিবন্ধীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ত্রুটি থাকলেও বোধ ও বোধির ঘাটতি নেই ; সেবা বা সর্জন ক্ষমতার খামতি নেই বরং অনেকে অশেষ দোষ বা গুণের আধার হয়ে নিখুঁত মানুষদের ছাপিয়ে ছাড়িয়ে উঠে অ-সাধারণ হয়ে উঠেছেন। সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অভিযান, খেলাধুলো, জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীরা যুগ যুগ ধরে বিস্ময়কর প্রতিভা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন ; ইতিহাসে স্থান লাভ করেছেন ভালো বা মন্দের কারিগররূপে।

মহাকাব্য সমাজের আয়না—সময়ের সাক্ষী। অতীতের প্রেক্ষাপটে বর্তমানের চালচিত্রে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা-সংকেত থাকে সেখানে। তার বুকে ভালো-মন্দ, স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক কত মানুষের ভিড়, ঠিক যেমনটি দেখা যায় সমাজে, আমাদের চারপাশে। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে, '....ইতিহাস-পুরাণং পুষ্পং তা অমৃতা আপঃ।' (তৃতীয় অধ্যায়, চতুর্থ খণ্ড) অর্থাৎ ইতিহাস ও পুরাণ পুষ্প। যজ্ঞীয় জল সেই পুষ্পের মধু।

পুরাণ রচয়িতারা তো ক্রান্তদর্শী, জীবনশিল্পী। প্রখর বাস্তববাদীও। আধ্যাত্মিকতা, প্রবল আস্তিক্যবাদ ও ভক্তিবাদপ্রসূত অলৌকিকতা বা নৈতিকতা, ন্যায়ধর্ম ও সত্যাদর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় তাঁদের বাস্তবচেতনা সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে যায়নি। তাই দেখা যায়, ঐহিক জীবনে আরাধ্য অবতারগণও ভুল করেন ; অনুশোচনা করেন। তাঁদের লীলাবসান সম্পর্কে কবিগণ কোন কষ্টকল্পনার আশ্রয় নেন নি ; আকাশ বা সমুদ্রের নীলে তাঁদের নশ্বর দেহ বিলীন করে দেন নি, তাঁদের মৃত্যুর কারণ ও পটভূমি উপস্থাপিত করেন বিশ্বাসযোগ্যরূপে। পত্নীবিরহ ও অনুতাপের দুঃসহ জ্বালা বুকে নিয়ে শ্রীরামচন্দ্র সরযূর জলে আত্মহত্যা করেন। শ্রীকৃষ্ণ রাম অবতারে অন্যায়ভাবে কিষ্কিন্ধ্যাধিপতি যে বালিকে বধ করেছিলেন, সেই বালির পুত্র অঙ্গাদ শ্রীরামের কাছ থেকে পাওয়া বরকে বাস্তবায়িত করার জন্য জরাব্যাধ নাম ধরে জন্মগ্রহণ করে এবং প্রভাস তীর্থে একটি গাছের ডালে বসে যদুবংশ

ধ্বংসের জন্য শোকার্ত কৃষ্ণ যখন আপন দেহত্যাগের কথা চিন্তা করছিলেন, সেই সময় তাঁর ঝুলন্ত রাঙা পা'টিকে হরিণের কান বলে মনে করে বাণ মারে। এইভাবে বিষ্ণুর অষ্টম তথা পূর্ণ অবতার শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সংবরণ হল, ব্যাধও লাভ করল স্বর্গারোহণের সুযোগ ঃ

মৃত্যু নাহি আছে যাঁর, জরা-হস্তে মৃত্যু তাঁর

এখানে রূপকের অন্তরালে নিহিতার্থটি হল, জরা-বার্ধক্যের কারণেই শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু ঘটে। ব্যাধের নামকরণেই এই সত্যের সঙ্কেত মেলে।

দৈব-মাহাত্ম্য বর্ণনা গুরুত্ব লাভ করলেও পার্থিব জগৎ ও জীবনের আলো-ছায়া পুরাণের সুবিশাল পটভূমি রচনা করেছে এবং মানুষের বৈষয়িক জীবনের পাশাপাশি তার মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও সেখানে কালান্তরের প্রেক্ষাপটে বিধৃত। এই কাব্যগুলির অঙ্গীরস মানবতা (human interest)। সে যাই হোক, মূল প্রসঙ্গে প্রবেশের আগে পুরাণ সম্পর্কে দু-চার কথা বলে নেওয়া ভালো।

প্রাচীন ভারতে যেমন ছিল স্বর্ণমুদ্রা নিষ্ক (ষোল মাষা) বা সোনার পরিমাণ বিশেষ যেমন ছিল মাষা (একের দশ বা একের বারো তোলা) ; তেমনি মাগধ যুগের সূচনাপর্বে (খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দীতে) রুপোর মুদ্রা প্রচলিত ছিল এবং তার নাম ছিল 'পুরাণ' (Purana) বা 'কার্ষাপন' (Karshapan) বা 'ধারণ' (Dharana) এবং তার ওজন ছিল প্রায় ২৯ রতি বা নিষ্কের ওজনের একের দশ ভাগ।

পুরাণ বলতে সাধারণভাবে বোঝায়, অতি প্রাচীনকালের বিখ্যাত ব্যক্তি, ধর্ম, সমাজ প্রভৃতি অবলম্বনে রচিত শাস্ত্র—বাল্মীকি, ব্যাস প্রভৃতি মুনি রচিত আখ্যায়িকা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়, " 'পুরাণ' অর্থে আদৌ পুরাতন ; পশ্চাৎ পুরাতন ঘটনার বিবৃতি। সকল সময়েই পুরাতন ঘটনা ছিল, এই জন্য সকল সময়েই পুরাণ ছিল।" (বঙ্কিম রচনাবলি, সাহিত্যসমগ্র, তুলি-কলম, পৃঃ ৪৩৮)।

প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষে প্রাচীন পৌরাণিক কথাগুলি গ্রন্থাকারে পরিবেশিত না হয়ে লোকের মুখে মুখে ফিরত এবং অনেক ক্ষেত্রে সেগুলি কিংবদন্তি মাত্রে পরিণত হয়েছিল। কালক্রমে প্রাচীন রচনা ও কিংবদন্তিগুলি সংগ্রহ করে এক একখানি পুরাণ সংকলিত হয়। অষ্টাদশ পুরাণ প্রণেতা ব্যাস এবং মহাভারতকার ব্যাস বা বেদবিভাগকর্তা ব্যাস অথবা পাতঞ্জল টীকাকার ব্যাস একই ব্যক্তি নন ; ব্যাস উপাধিধারী ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হওয়াটাই সম্ভব।

বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম সভাকবি কালিদাসের 'মেঘদূতম্' কাব্যের একটি শ্লোকে বিষ্ণুর রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

যেন শ্যামং বপুরতিতরাং কান্তিমালপ্স্যতে তে
বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ।

পনেরো সংখ্যক শ্লোকটিতে বিষ্ণু (গোপবেশ নেই)-র অবতার কৃষ্ণের চূড়াস্থিত ময়ূরপুচ্ছের উপমান হিসেবে মেঘের বুকে ইন্দ্রধনু ব্যবহৃত হয়েছে। কৃষ্ণের ময়ূরপুচ্ছচূড়ার কথা আছে বিষ্ণু পুরাণের পরবর্তীকালে রচিত হরিবংশে। তদনুবর্তী ব্রহ্ম পুরাণ, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রভৃতি পুরাণে তো কৃষ্ণচূড়াস্থিত ময়ূরপুচ্ছের কথা আছেই। এই যুক্তির ভিত্তিতে বঙ্কিমচন্দ্র এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, "অতএব ইহা নিশ্চিত যে কালিদাসের পূর্বে অর্থাৎ অন্তত ষষ্ঠ শতাব্দী পূর্বে হরিবংশ অথবা কোনো বৈষ্ণব পুরাণ প্রচলিত ছিল।" (বঙ্কিম রচনাবলি, সাহিত্য সমগ্র, তুলি-কলম, প্রথম সং, পৃঃ ৪৪০)।

পুরাণের স্থান কালাতিশায়ী সর্বজনীন আবেদন ও বিবর্তনশীল যুগেও সেগুলির প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে বলা যায়, 'পুরা অপি নবম্' অর্থাৎ পুরনো হয়েও যা নতুন তাই হল পুরাণ।

স্মার্ত ভট্টাচার্য মলমাসতত্ত্বে বলেছেন, অষ্টাদশ পুরাণানি পুরাণজ্ঞাঃ প্রচক্ষতে। ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা। তথান্যন্নারদীয়ঞ্চ মার্কণ্ডেয়ঞ্চ সপ্তমম্। আগ্নেয়মষ্টমঞ্চৈব ভবিষ্য নবমং তথা। দশমং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং লৈঙ্গামেকাদশং তথা। বারাহং দ্বাদশঞ্চৈব স্কান্দঞ্চাত্র ত্রয়োদশম্। চতুর্দ্দশং, বামনকং কৌর্মং পঞ্চদশন্তথা। মাৎস্যঞ্চ গারুড়ঞ্চৈব ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ ততঃপরম্। অর্থাৎ পুরাণজ্ঞদের মতে পুরাণ আঠারোটি যেমন, ব্রহ্ম পুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত পুরাণ, নারদীয় পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, অগ্নিপুরাণ, ভবিষ্যৎ পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, লিঙ্গ পুরাণ, বরাহ পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ, বামন পুরাণ, কূর্মপুরাণ, মৎস্য পুরাণ, গরুড় পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ও শৈব বা বায়ু পুরাণ।

এগুলিকে বলা হয়ে থাকে মহাপুরাণ। স্মরণে রাখার সুবিধার জন্য মহাজন-প্রবর্তিত সঙ্কেতটি হল, 'ম' দ্বয়ং, 'ভ' দ্বয়ঞ্চৈব 'ব্র' ত্রয়ং, 'ব' চতুষ্টয়ম্। 'অ', 'না', 'প', 'লিং', 'গ', 'কূ' স্কাখ্যমষ্টাদশ পুরাণকম্। অর্থাৎ সূত্রটিতে পুরাণগুলির আদ্যক্ষরের সংখ্যা ২+২+৩+৪+১+ ১+১+১+১+১+১ ধরে মোট ১৮টি।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণ অনুসারে মহাপুরাণকে তিনভাগে বিভক্ত করা চলে যেমন, (১) সত্ত্ব গুণ অনুসারে বিষ্ণু, নারদীয়, ভাগবত, গরুড়, পদ্ম ও বরাহ পুরাণ। (২) রজোগুণ অনুসারে ব্রহ্ম, ব্রহ্মবৈবর্ত, ব্রহ্মাণ্ড, ভবিষ্য, মার্কণ্ডেয় ও বামন পুরাণ এবং (৩) তমোগুণ অনুযায়ী, মৎস্য, কূর্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ ও অগ্নিপুরাণ।

কূর্ম পুরাণে বলা হয়েছে, 'অন্যান্যুপপুরাণানি মুনিভিঃ কথিতান্যপি তানি চ'। অর্থাৎ, মুনিগণ অন্যান্য উপপুরাণের উল্লেখও করেছেন। আঠারোটি পুরাণের মতো উপপুরাণও আছে আঠারোটি যেমন, আদি বায়ু, নৃসিংহ, নাবদীয়, উশনঃ, নন্দিকেশ্বর শিবধর্ম, কালিকা, দৈবং বা দেবী পুরাণ, দুর্বাসা, কপিল, বরুণ, শাম্ব, মহেশ্বর, পদ্ম, পরাশর, মরীচি, ভাস্কর।

মতান্তরে, বায়ু বামন, ব্রহ্মাণ্ড, মরীচি ও ভার্গবের বদলে মানব, নন্দিকেশ্বর, আদিত্য,

ভাগবত ও বশিষ্ঠ এবং নন্দিকেশ্বর, পদ্ম ও দেব পুরাণের জায়গায় বামন, ব্রহ্মাণ্ড ও ভার্গব পুরাণ।

ভারতীয় সকল শাস্ত্রের উৎস বেদ। পুরাণ বেদেরই ব্যাখ্যাবিশেষ। এই কারণে বেদে ইতিহাস পুরাণকে বলা হয়েছে পঞ্চমবেদ। বেদ ও পুরাণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ছান্দোগ্য উপনিষদে ; অথর্ববেদেও বলা হয়েছে ঃ

'ইতিহাস পুরাণং পঞ্চম্ বেদানাং বেদম্'

মহাভারতের আদিপর্বে কবি বলেছেন,

ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃং হয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্ বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি।
পুরাণ-পূর্ণচন্দ্রেণ শ্রুতি জ্যোৎস্না প্রকাশিতা।
নৃবুদ্ধি কৈরবাণাঞ্চ কৃতমেতৎ প্রকাশনম্।।

অর্থাৎ, বেদের অর্থ প্রকাশিত করবে ইতিহাস পুরাণের সাহায্যে। ইতিহাস ও পুরাণে যাঁদের জ্ঞান নেই, তাঁদের দ্বারা বেদের অপব্যাখ্যা হওয়ার আশঙ্কা থাকে। শ্রুতি বা বেদ গূঢ়ার্থ-দ্যোতক ও সংক্ষিপ্ত ; তাই এই শাস্ত্রটিকে জ্যোৎস্নার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অন্যদিকে উপমেয় পুরাণের উপমান পূর্ণচন্দ্র কারণ এটি আকারে বিশাল এবং প্রকৃতিগত বিচারে সরল ও প্রাঞ্জল। পুরাণ রূপ পূর্ণচন্দ্রমার সাহায্যে শ্রুতিরূপ জ্যোৎস্না উদ্ভাসিত হয় ; এবং এই পুরাণরূপ চাঁদের আলোয় প্রস্ফুটিত হয় মানুষের বুদ্ধিরূপ পদ্মটি।

মহামুনি ব্যাস লিখেছেন ঃ

বেদে রামায়ণে চৈবপুরাণে ভারতে তথা।
আদৌ চান্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে।।

কাশীরাম দাসের ভাবানুবাদে যার অর্থ দাঁড়ায় ঃ

বেদ রামায়ণে আর আছয়ে ভারতে।
ইত্যাদি যতেক শাস্ত্র আছে ত্রিজগতে।।
এ সকল বিচারিয়া কহি পুনঃ পুনঃ।
আদি অন্ত মধ্যে সব হরিগুণ-গান।। [কা. ম. পৃঃ ২৪]

বৈদিক সাহিত্যে পুরাণে ভক্তিবাদের প্রাবল্য স্পষ্ট।

বেদ ও পুরাণের অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক সম্বন্ধে মহাভারতকার বলেছেন ঃ

চারিবেদ ষট্ শাস্ত্র একভিতে কৈল।
ভারত-সংহিতা মুনি তুলেতে তুলিল।।
ভারেতে অধিক তেঁই হইল ভারত।
বিবিধ পুরাণ গ্রন্থ যাহার সম্মত।। [কা. ম. পৃঃ ২৫]

ব্রহ্মার নির্দেশে ব্যাসদেব বেদকে চার ভাগে বিভক্ত করার সময় রোমহর্ষণ নামে তাঁর এক শিষ্যকে ইতিহাস ও পুরাণ অধ্যয়ন করতে দেন।

রামায়ণ ও মহাভারত পুরাণ হিসেবেই পরিচিত।

রামায়ণে আদিকাণ্ডে দেখা যায়, ব্রহ্মা বাল্মীকিকে বলছেন ঃ

শ্লোক ছন্দে তুমি যেবা করিবে পুরাণ।
জন্মিয়া সে সব কর্ম্ম করিবেন রাম ।। [কৃ. রা. পৃঃ ৩৭]

আবার মহাভারতে স্বর্গারোহণপর্বে মহাভারত পাঠের ফল বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

শ্রীমহাভারঁত এক উৎকৃষ্ট পুরাণ,
পরম-পবিত্র পুনঃ বেদের সমান।। [কা. ম. পৃঃ ১২০৩]

বা,

কিবা পুণ্য চতুর্ব্বেদে, কিবা রামায়ণে।
কিবা এই পুণ্যময় ভারতে পুরাণে।। [কা. ম. পৃঃ ১২০৫]

রাজা জন্মেজয়ের প্রতি অন্তর্যামী সর্বজ্ঞ শ্রী বেদব্যাস মুনির তাঁর শিষ্য শ্রী বৈশম্পায়নের কাছ থেকে শ্রী মহাভারত শ্রবণের উপদেশদান বর্ণনা প্রসঙ্গে কাশীরাম ভারত-কথাকে 'পুরাণ' বলেই বর্ণনা করেছেন ঃ

এত বলি মুনিরাজ গেল নিজ স্থান।
অনুমতি দিয়া শিষ্যে বর্ণিতে পুরাণ।। [কা. ম. পৃঃ ৬৮]

স্থাবর জঙ্গম, ব্রহ্মের স্বরূপ ও তাঁর সাকার ও নিরাকার বর্ণন, অন্ততত্ত্ব বিশ্লেষণ, দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, মানুষ প্রভৃতির বিবরণ, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রাচীন রাজ পরিবারের কাহিনি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় যে গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত এবং যে গ্রন্থ দ্বারা ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায় ও জ্ঞানের শুচিতা, বুদ্ধির গভীরতা জন্মায় তাকে পুরাণ বলা হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সাংখ্যযোগে 'অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে' শ্লোকাংশটিতে 'পুরাণ' শব্দটির অর্থ পরিণামশূন্য বা সনাতন। সেদিক থেকে বলা চলে, যে সাহিত্য চির-নবীনতায় বিদ্যমান ; তাকেই বলে পুরাণ।

এক এক পুরাণে 'পুরাণ' শব্দটির অর্থ এক এক রকম করা হয়েছে। বায়ু পুরাণে বলা হয়েছে, 'পুরা হ্যনিতীতি পুরাণম্' অর্থাৎ, পূর্বকালে যা প্রাণবন্ত ছিল, তা-ই পুরাণ। আবার কোনো কোনো পৌরাণিকের মতে,

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্।।

পুরাণ প্রাচীনকালের ইতিহাস বা জনশ্রুতি অবলম্বনে রচিত এবং সর্গ বা সৃষ্টি, প্রতিসর্গ বা প্রলয়, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত—এই পাঁচটি সাধারণ লক্ষণযুক্ত শাস্ত্র বলে সাধারণভাবে অভিহিত হলেও তা যেমন কালবিমুখ বা সমাজনিরপেক্ষ নয়, তেমনি উদ্দেশ্যহীন কল্পনাবিলাস নয়। মহাকাব্য ও পুরাণের আঁজরেপাঁজরে উপযোগবাদের ছাপ। আত্মপরিচয়দান প্রসঙ্গে কৃত্তিবাস বলেছেন ঃ